সমতার কথা বলত। সাধারণ সামাজিক অধিকারের বিষয় নিয়ে ভাবত। হয়তো বা নিম্নতর শ্রেণীর মানুষের কথাও তাদের দাবির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। যদিও নিম্নতর শ্রেণীর কথা সীমিতই থাকত। আর একথা উল্লেখ না করলেও চলে যে নরমপন্থীদের কোন একটি দাবিতেও ঔপনিবেশিক প্রশাসন কর্ণপাত করেনি।

এসব নিঃসন্দেহে নরমপন্থীদের পরাজয়। তা সত্ত্বেও নরমপন্থীদের সবচেয়ে

Scanned with CamScanner

তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক অবদান হল ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক চরিত্র উদ্‌ঘাটন। প্রায়শ একে বলা হয়ে থাকে অর্থনৈতিক জাতীয়াবাদ।[৩] পরবর্তীকালের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এইটি প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। এমনকী এই চিন্তাধারা স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস সরকারের অর্থনৈতিক নীতিগুলিকে অনেকটা প্রভাবিত করে। এই প্রসঙ্গে তিনটি নাম স্মরণীয়: সফল ব্যবসায়ী দাদাভাই নওরোজী, বিচারক এম. জি. রাণাডে এবং অবসরপ্রাপ্ত আই.সি.এস. আধিকারিক আর. সি. দত্ত যিনি দুই খণ্ডে *The Economic History of India* গ্রন্থটি প্রকাশ করেন (১৯০১–৩ খ্রি:)। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় ছিল ভারতবর্ষের দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্য ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্টি করা হয় অবাধ বাণিজ্যের ধ্রুপদী অর্থনৈতিক তত্ত্ব প্রয়োগ করে। নরমপন্থীরা যুক্তি দিয়ে বলেন যে, উনিশ শতকে ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক চরিত্র পরিবর্তিত হয়। অর্থসর্বস্ব বাণিজ্যতন্ত্র (মার্কেনটাইলিজম), নজরানা আদায়, লুটপাট ইত্যাদি শোষণের পুরোনো ও সোজাসাপ্টা পদ্ধতিগুলি পরিত্যক্ত হয়। পরিবর্তে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ ও অবাধ বাণিজ্যের মাধ্যমে শোষণের স্বল্প দৃশ্যমান কিন্তু অনেক বেশ পরিশীলিত পদ্ধতি চালু হয়ে যায়। এর ফলে ভারতবর্ষ কৃষিজ কাঁচামালের সরবরাহকারীতে পরিণত হয়। সেই সঙ্গে সে খাদ্যসামগ্রীও ব্রিটেনে সরবরাহ করত। আবার ব্রিটেনে তৈরি দ্রব্যাদি ভারতবর্ষের বাজারে বিক্রি হত। এতে ভারতবর্ষের কৃষিপ্রধান অর্থনীতি একেবারে ব্রিটেননির্ভর হয়ে ওঠে। এই দেশ ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ভারতীয় মূলধন বিনিয়োগ করে শিল্পায়ন ঘটিয়ে ভারতবর্ষের উন্নয়ন করা যেত। কিন্তু এদেশে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের ফলে লভ্যাংশ বিদেশে চলে যেত। অর্থাৎ সম্পদের নির্গমন ঘটত। এই অর্থ নির্গমনের তত্ত্বই ছিল অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের মূল আলোচ্য বিষয়। বলা হয় যে, ব্রিটিনের "হোম চার্জেস্" তথা ব্রিটিশ আধিকারিকদের অবসরকালীন ভাতা, বেতন, অন্যান্য ভাতা ইত্যাদি, সামরিক খরচ প্রভৃতি ভারতীয় অর্থ থেকেই মেটানো হত। এতেই ভারতীয় অর্থের নির্গমন ঘটত। এমনকী রেল শিল্পে যে টাকা লগ্নি করা হত, তার ওপর প্রতিশ্রুত সুদের টাকাও ভারতীয় অর্থ থেকেই মেটানো হত। এটিও দেশীয় সম্পদ নির্গমনের আরেকটি কারণ। ১৮৯০-এর দশকে দেশীয় টাকার বিনিময়ের হার পড়ে যায়। ফলে এদেশের অর্থনীতির ওপরে চাপ বাড়ে। সেই চাপ আরও বেড়ে যায় বাজেট ঘাটতি, উচ্চতর হারে কর বৃদ্ধি এবং সামরিক খরচের কারণে। নওরোজী হিসেব কষে দেখান যে, বছরে ১২ মিলিয়ন পাউন্ড অর্থ এদেশ থেকে নির্গত হয়। উইলিয়াম ডিগবির হিসেবে এই পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ৩০ মিলিয়ন পাউন্ডে। গড়ে ব্রিটিশ-ভারতীয় সরকারের মোট রাজস্ব আয়ের প্রায় অর্ধেকটাই বেরিয়ে যেত। এই ঘটনা ভারতকে সরাসরি নিঃস্ব করে দেয়। এবং মূলধন তৈরির প্রক্রিয়াকে একেবারে নিষ্ক্রিয় করে তোলে। উচ্চহারে ভূমি রাজস্ব ধার্য হওয়ার ফলে

প্রথম পর্যায়য়ার ফলে জায়গা জমি বেহাত হয়ে যায়। কৃষক সম্প্রদায় নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুকারকদের স্বার্থে কোন আমদানি শুল্ক বা মাশুল বসানো যায়নি। ফলে ভারতবর্ষের শিল্পায়ন ব্যহত হয়। এবং ভারতীয় হস্তশিল্প ধ্বংস হয়। এর পরিণামে কৃষির ওপরে অতিরিক্ত চাপ পড়ে। দেশের দারিদ্র্য আরও বাড়ে। ভারতবর্ষের আর্থিক দুর্দশা চক্রবৎ এইভাবেই ঘটতে থাকে। নওরোজী হিসেব কষে দেখেন ভারতীয়দের মাথাপিছু আয় ২০ টাকা। ডিগবির হিসেবে ১৮ টাকা ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু সরকার এই হিসেব মানেনি। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে রিপনের অর্থসচিব হিসেব কষে দেখেন যে, ভারতীয়দের মাথা পিছু আয় ছিল ২৭ টাকা। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জনের আমলে এই আয় ছিল ৩০ টাকা। এই আমলে ভারতে দুর্ভিক্ষ ও মহামারি ঘটে। ফলে অবস্থাটা সরকারি হিসেবের সঙ্গে মেলে না। আবার দাদাভাই নওরোজীর কথায় ফেরা যাক। তিনি বলছেন ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয়রা "বস্তুগত" দিক দিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। তাদের কাছে ব্রিটিশ শাসন "মিশ্রির ছুরির মত ছিল। কোন পীড়ন ছিল না। সবটাই মসৃণ ও সুমিষ্ট। তবুও তা ছিল ছুরি"।[৪]

এহেন অবস্থার প্রতিকার হিসেবে নরমপন্থীরা অর্থনৈতিক নীতির পরিবর্তন ঘটতে চেয়েছিলেন। এই মর্মে যেসব সুপারিশ তারা করেছিলেন সেগুলি হল: সামরিক খরচ ও করের বোঝা কমানো, সামরিক খরচপাতির পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা, ভারতীয় শিল্পকে নিরাপত্তা দেওয়ার নীতি গ্রহণ, ভূমি রাজস্ব মূল্যায়ন কমানো, রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি বন্দোবস্তের এলাকায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করা, কুটির শিল্প ও হস্তশিল্পকে উৎসাহদান। কিন্তু এসব দাবির একটিও পূরণ হয়নি। ১৮৭০-এর দশকে আয়কর উঠে যায়। কিন্তু আবার তাকে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে বসানো হয়। লবণকর ২টাকা থেকে বাড়িয়ে ২.৫০ টাকা করা হয়। আমদানি শুল্ক বসানো হয় ঠিকই তবে পাল্টা ভারতীয় সুতির তন্তুর ওপরেও অন্তঃশুল্ক বসানো হয় ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে তা কমিয়ে সাড়ে তিন শতাংশ করা হয়। ফাউলার কমিশন কৃত্রিমভাবে ভারতীয় টাকার মূল্য ব্রিটিশ মুদ্রায় বেঁধে দেন ১ শিলিং ৪ পেন্সে। কৃষিক্ষেত্রে মৌলিক কোন পরিতর্বনই ঘটেনি। আলফ্রেড লায়ালের মত ঔপনিবেশিক বিশেষজ্ঞেরা মনে করতেন ভারতীয় কৃষি তার স্থানু অবস্থা কাটিয়ে উঠে উন্নয়নের আধুনিক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কাজেই ভারতীয় কৃষিতে পশ্চাদ্‌গতি অপেক্ষা অগ্রগতির লক্ষণই বেশি ছিল। এইভাবে প্রশাসনিক বা সাংবিধানিক কর্মসূচীর মত নরমপন্থীদের অর্থনৈতিক কর্মসূচীও অবাস্তবায়িত থেকে যায়।

জাতীয়তাবাদী এই অর্থনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে তর্ক চলতে পারে (২.৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তবে এক বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে ঔপনিবেশিক শাসনের সমালোচনার মাধ্যমে তার অর্থনৈতিক চরিত্র উদ্‌ঘাটনের অবশ্যই রাজনৈতিক ও নৈতিক তাৎপর্য ছিল। ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে ভারতবর্ষের দারিদ্র্য সংযুক্ত করে

Scanned with CamScanner